সেই আশ্চর্য বাড়িটা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

গৌহাটির পল্টন বাজারে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা তিনজন। শিলং যাবার জন্য ট্যাক্সি ধরব। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, বাবু, আরেকটু সবুর করুন। প্যাসেঞ্জার পাবই। তাহলে ট্রিপের টাকা আপনারা চারজনায় ভাগ করে নেবেন।

আমাদের কিন্তু ভীষণ অসহ্য ঠেকছিল এই বেকার দাঁড়িয়ে থাকাটা। একবার গাড়িতে চেপে বসলেই শিলং। কিন্তু সেটাই যেন আর হবার নয়। সেই ভোর থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি, তার মানে শিলঙেও খুব একটা রোদ পাওয়া যাবে না। এ দিকে আরেকটা প্যাসেঞ্জারের জন্য যেভাবে তীর্থের কাকের মতো বসে আছি তাতে ধারণা হচ্ছে, আমরা বুঝি-বা খোদ বদরীনাথে যাওয়ার লোক খুঁজছি। চন্দন হঠাৎ বলল, শিলঙে কি বেড়ানো বন্ধ করে দিয়েছে লোক? সামনের সিটেই উদাস দার্শনিকের মতো বসে থাকা ড্রাইভার কথাটা শুনে একটু দুঃখই পেল। একটা লম্বা বিড়ি ধরাতে ধরাতে সে বলল, স্যার, এবার তো মনসুন লেগে গেল। এখন আর অত টুরিস্ট পাবেন কী করে! আসতেন মে-জুন মাসে, দেখতেন, ভিড় কাকে বলে। সারাদিন কত যে ট্রিপ যায়।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা চারটে। পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। অতএব কাজের কথা আগেভাগে শেষ করাই ভালো। আমি ড্রাইভারকে বললাম, শিলং পৌঁছে সস্তার হোটেলে ঢুকিয়ে দিয়ে কাট মারবে। বাপ্পা এবার সমস্যাটা আরও সহজ করে দিল, ড্রাইভারমশাই, আমাদের পকেট কিন্তু হালকা। এমন কোথাও ঢোকাবেন না যেখানে একদিন থাকলেই প্যান্ট বিক্রি হয়ে যাবে।

এবার তামাকে ছ্যাঁদলা পড়া দাঁত বার করে হাসতে লাগল আমাদের ড্রাইভার। কী যে বলেন আপনারা! আপনারা তো স্টুডেন্ট আছেন। বলুন, ঠিক কিনা?

ড্রাইভারের কথায় একটু রাগ হল বাপ্পার। সে বলল, স্টুডেন্ট আছি বলে কি দোষ করেছি?

আরে রাম, রাম! আমি কি সেই কথাই বললাম? বলতে চাইলাম যে, আপনারা স্টুডেন্ট আছেন বলে আপনাদের পয়সাও কম আছে। বেশি পয়সা নাই।

বাপ্পা বলল, সে তো নাই তাতে...

আর সেইজন্যই তো আপনাদের বসিয়ে রাখছি। আরেকটা প্যাসেঞ্জার পেলে আপনাদের অনেক টাকা বেঁচে যাবে।

এবার আমি হোটেল বিষয়ে একটা জরুরি খবর নিতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ছাই ছাই রঙের প্রিন্স কোট পরা ভদ্রলোক এসে ড্রাইভারের কাছে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, শিলং যাবে? আর অমনি আমাদের ড্রাইভার তড়াক

করে লাফিয়ে উঠল, হাঁ, হাঁ বাবু আসুন। তিরিশ টাকা লাগবে। ভদ্রলোক খুব গম্ভীরভাবে ছোট্ট করে বললেন, জানি।

বাপ্পা, চন্দন আর আমি এবার সেট হয়ে গেলাম সিটে। ভদ্রলোক টুকুস করে একটা পাইপ ধরিয়ে বসে গেলেন সামনে। ড্রাইভার ছুটে গিয়ে একবার কাপড় দিয়ে উইণ্ডস্ক্রিনটা ঘষে দিয়ে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। এতক্ষণ দম বন্ধ হয়ে এক কোণায় বসেছিল চন্দন। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাপরে, বাঁচা গেল।

কিন্তু সেরকম কিছু বাঁচা হল না আমাদের। গাড়ি গৌহাটি শহর তখনও পার হয়েছে কি হয়নি অমনি নামল মুষলধারে বৃষ্টি। সামনের ভদ্রলোক চটপট পাইপ নিবিয়ে জানালার কাচ তুলে দিলেন। কাচ তুলে দিলাম আমরাও। বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটায় ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে উইণ্ডস্ক্রিন। ধারের কাচ দিয়েও কিছু দেখার জো নেই। ড্রাইভার ফের তার সেই দার্শনিক মুখভঙ্গি করে বলল, শিলং পৌঁছোতে এবার বেশি সময় লেগে যাবে স্টুডেন্ট দাদাবাবু। তবে একটা ছোটো হোটেল আমি চিনি শিলঙের বাইরে। বেশ সস্তা আছে। আপনারা চান তো সেখানেই নামিয়ে দেব।

আমার রাগ হচ্ছিল এবার নিজেরই ওপরে। ওই তিরিশ টাকা বাঁচানোর জন্য এতখানি টাইম নষ্ট করার মূলে আমি নিজেই। যেই ড্রাইভার বলল, বসুন, সওয়ারি পাব অমনি তাতে সায় দিয়ে বসলাম। যখন-তখন যা-খুশি ডিসিশান নেওয়ার এই এক-রাগ আমার। এবার তাই রাগে রাগে বললাম, না, না তোমাকে আর উপকার করতে হবে না। তুমি আমাদের শিলঙেই নামিও। পয়সা কম আছে সে আমরা বুঝব। তোমাকে সর্দারি করতে হবে না।

আমার এই শেষের উক্তি শুনে এবার বেজায় অভদ্রমতো হা-হা হা-হা করে হাসতে লাগলেন সামনের লোকটা। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, কী মশাই, আপনারা কলকাতার লোক। স্টুডেন্ট? পকেটে পার হেড দুশো টাকা? সস্তার হোটেল খুঁজছেন? রাইট?

কী আশ্চর্য! আমাদের চেনে না, জানে না, অথচ এতগুলো অসম্মানজনক প্রশ্ন একটার পর একটা করে গেল? লোকটার কি মাথা খারাপ নাকি? আমি কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমাকে থামিয়ে চন্দন বলল, আপনি ঠিক ধরেছেন মশাই। আমরা স্টুডেন্ট, পকেট গড়ের মাঠ, সস্তার হোটেল চাই, পারলে দু-দশ টাকা ধার দেবেন?

আর অমনি মাথা ঘুরিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আলবত! দেব না মানে কী! কলকাতার ছেলে আপনারা; দেব না! ইচ্ছে হলে জোর করে দেব। তা কোথায় উঠছেন আপনারা?

সত্যি বলছি আমরা তিনজনেই একেবারে ক্যাবলা হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের এইসব কথাবার্তা শুনে। ভাবলাম, এমনও বাঙালি আছে তা হলে, যে না চাইতে অন্যকে পয়সা দেয়! তাও না চিনে, না জেনে। বাপ্পারও মনের ভাবখানা প্রায় একইরকম হয়েছিল। সে রীতিমতো গদগদ হয়ে বলল, আপনি একটা দারুণ লোক মশাই। বিজ্ঞানমনস্ক ছেলে চন্দন বলল, কিন্তু আপনি লোকটা কে দাদা?

আবার একটা লম্বা হাসি শুরু করলেন ভদ্রলোক? নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি তো! তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমার নাম প্রতাপ গুহ। কলকাতায় সলিসিটার্স ফার্ম আছে। শিলং পিকের পথে আমার দাদুর মকান আছে। আমি সুযোগ পেলেই এখানে এসে দু-চারদিনের বিশ্রাম নিয়ে যাই।

আমার এই বাড়িতে একটি নেপালি কেয়ারটেকার আছে। তাঁর বয়স ষাট, নাম ব্যোমবাহাদুর। এই বুড়ো বয়সে সে একটা বিয়েও করে বসেছে। বাড়ির ডেক বারান্দা দিয়ে আপনারা সারাক্ষণ শিলং পিক দেখতে পাবেন। পিছনে একটা ঝরনা আছে, সারাদিন ঝিরঝির করে জল পড়েই যাচ্ছে। আর আছে রাস্তায় কতকগুলো অসাধারণ পাইন গাছ। দেখলে মনে হবে এগুলো কেউ এঁকে রেখেছে পাহাড় এবং আকাশের গায়ে।

ভদ্রলোক আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাপ্পা ফের ওর সেই ছেলেমানুষি ঢঙে বলল, আপনি মশাই খুব লাকি। ভদ্রলোক যেন এর কথা শুনতেই পাননি এমন ভাব করে বলে চললেন, কিন্তু বাড়িটা খুব নির্জন। থাকার লোক বিশেষ নেই। হয়তো আমি মানুষটা তেমন সুবিধের নয়। কিংবা...

না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, এখানে আপনার পরিবার-পরিজন কেউ নেই?

-না!

-কেন, তাদের...

—প্রথমত, বিবাহ করিনি। দ্বিতীয়ত, আত্মীয়বর্গ পছন্দ করি না। তার চেয়ে বরং রাস্তায় আলাপ হওয়া লোকজনকে নিয়ে বাড়িতে রাখব।

-কোনো স্থায়ী বন্ধু করতেও চান না?

—কোনো বন্ধুত্বই স্থায়ী নয় ইয়ং ফ্রেণ্ড। একরাত, দু-রাত, দ্যাটস এনাফ।

আমার বলতে দ্বিধা নেই লোকটার এই ধরনের কথাবার্তায় ভীষণ কৌতূহল বোধ করছিলাম ওর বিষয়ে। তাই বললাম, কাল একবার শিলং পিকে যাব

আমরা। যদি আপত্তি না থাকে তখন না হয় আপনার বাড়িটা আমরা দেখে আসব। আমায় কথা তখনও শেষ হয়নি। ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন, এটা কি একটা কথার কথা মশাই। বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাঙালি ছাত্র আপনারা। থাকবেন আমার ডেরায়। অন্যত্র যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একটা বড়ো কার্পেট শেয়ার করে শুতে পারবেন না?

গদগদ কণ্ঠে বাপ্পা বলে উঠল, কার্পেটের কী দরকার? একটা জায়গা পেলে আমরা আমাদের বেডিং পেতেই শুয়ে পড়ব।

ভদ্রলোক, অর্থাৎ প্রতাপ গুহ বললেন, ওঃ নো! কার্পেটটা আপনাদের দরকার হবে। এ ছাড়া ফায়ার প্লেসে একটা আগুনের বন্দোবস্তও করে দেব। বাট দি ওনলি প্রবেলম ইজ ব্যোমবাহাদুর এখন দেশে গেছে। আজকের রাতের খাওয়াটা বাইরে সারতে হবে।

তাতে কী আছে? তাতে কী আছে? বলে প্রচন্ড ভদ্রতায় প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। মনে মনে সেই সঙ্গে হিসেব করে নিলাম আমাদের হস্টেল খরচ কতখানি বাঁচল। তারপর মুখে বললাম, শিলঙে কোথাও নেমে রাতের ডিনার কিনে নিলেই হবে। সিটের ওদিক থেকে চন্দন বলে উঠল, তা হলে স্যার আপনার ডিনারটাও আমাদের কিনতে দেবেন। প্লিজ!

প্রতাপবাবু তাঁর পাশের কাচটা একটু নামিয়ে দেখলেন জল খানিকটা ধরেছে। তিনি কাচটা আরও নামিয়ে ফের তাঁর পাইপটা ধরালেন। একটা মস্ত ধোঁয়া ছেড়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, না ভাই, আমার ডিনার আমার সঙ্গেই আছে।

এরপর আমরা বহুক্ষণ চুপ রইলাম। প্রতাপবাবুও নীরবে পাইপ খেতে থাকলেন। একসময় নিভে যাওয়ার পরেও ঠোঁটে আগলে রাখলেন তাঁর দামি পাইপ। মাঝে মাঝে তিনি নিজের মনে গুনগুন করে গাইছিলেন একটা বিলিতি সুর। শিলঙে ঢুকব ঢুকব করছি, তখন ড্রাইভার হঠাৎ একটা হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, খাবার-দাবার কেনার থাকলে এখানেই কিনে নিন বাবুরা। এটা সস্তার জায়গা আছে।

ফের ওর মুখে ওই সস্তা কথাটা শুনে আমরা তিন বন্ধুই এবার নির্মল আনন্দে হেসে উঠলাম। চন্দন টাকা নিয়ে খাবার আনতে নেমে গেল। ড্রাইভার তার সেই লম্বা একটা বিড়ি ধরিয়ে কীরকম আপনমনেই বলে গেল, সবসময় কিন্তু সস্তা খুঁজলে বিপদ আছে। কোথায় কী গোলমাল হয়।

আমি স্পষ্ট নজর করলাম ড্রাইভারের এই উক্তিতে প্রতাপ গুহ কিছুটা চমকে উঠলেন। আমার মনে হল ড্রাইভারের কথাটা বিদ্রুপাত্মক এবং সেটা প্রতাপবাবুর ভালো লাগল না।

কথাটায় আমি আর বাপ্পা একটু কৌতুকই অনুভব করেছিলাম। তাই কেউ আর তেমন করে প্রতিবাদও করলাম না।

আমরা যখন শিলং পিকের অ্যাপ্রোচের রাস্তায় প্রতাপ গুহর বাড়ির সামনে পৌঁছোলাম তখন রীতিমতো অন্ধকার। কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেছে। একটা নির্জন রাস্তার শেষ প্রান্তে বাড়িটা। বাড়ির মুখটায় পাইন গাছ। ঠিক যেমনটি প্রতাপবাবু গাড়িতে বলেছিলেন। ওই জমে আসা অন্ধকারের মধ্যেও দেখলাম বাড়িটা বেশ বনেদি চেহারার। যদিও খুবই পুরোনো। ডেক বারান্দাটা তো প্রায় খসেই পড়েছে। মস্ত মস্ত টর্চ জ্বেলে বাড়ির দিকে পা ফেলতেই কেন জানি না গা-টা একটু ছমছম করে উঠল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম প্রতাপবাবু

ঠিক মতন হাঁটছেন না, কিছুটা যেন ভেসে ভেসে যাচ্ছেন উঁচু-নীচু জমির ওপর দিয়ে। চন্দন আর বাপ্পা সেটা দেখেনি। আমার তীব্র বাসনা হল দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিটায় চেপে বসি। কিন্তু তখনই প্রায় মোড় ঘুরে ট্যাক্সিটা মিলিয়ে গেল পাইন গাছের সারির পিছনের অন্ধকারে।

নিরুপায় হয়ে সামনের দিকে হাঁটলাম। ঠিক করলাম চন্দন বা বাপ্পাকে কিছু বলব না। আমার চোখের ভুলও তো হতে পারে, বিশেষত এই অন্ধকারে।

ঘরের দরজায় যখন এসে পড়েছি স্পষ্ট শুনতে পেলাম কাছেই একটা ঝরনার জল গড়াচ্ছে ঝিরঝির, ঝিরঝির করে। আর ওই ঝরনার জলের শব্দেই কীরকম ভয়টা আমার উবে গেল। এবার দরজা খুলে প্রতাপবাবু বললেন, মশাইরা সামনের এই ঘরটার দখল নিন। আমার ঘর ওই ঝরনার দিকে।

আমি টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে থাকলাম ঘরটার কীরকম জীর্ণ দশা। কিন্তু তাও বলব এক কাঁড়ি টাকা গুনে হোটেলে থাকার চেয়ে ঢের ভালো। প্রতাপবাবু এবার বাড়ির পিছনের দিকে গিয়ে আলোর মেন সুইচ অন করলেন। আর ঠিক ওইখান থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, নিন, এবার ঘরের সুইচ অন করুন।

কিন্তু সুইচ কোথায়! অন্ধকারে টর্চ ফেলে ফেলে কেবল সুইচ হাতড়ে বেড়াচ্ছি। এইভাবে গোটা ঘরটা দু-পাক দেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু কোথাও সুইচ খুঁজে পেলাম না। আমি চেঁচিয়ে বললাম, স্যার সুইচ খুঁজে তো পাচ্ছি না। বাড়ির ও প্রান্ত থেকে প্রতাপবাবুর আওয়াজ ভেসে এল, বাঁ-দিকের বইয়ের তাকের পিছনে দেখুন।

আমার এই হতভম্ব অবস্থা দেখে বাপ্পা আর চন্দন দু-জনেই আমায় খিঁচিয়ে উঠল, আরে, ছেলেটার কী হল? বইয়ের তাকের সামনে দাঁড়িয়েও বইয়ের তাক খুঁজে পাচ্ছে না।

আসলে তখন টর্চের আলোয় তাকের উপরে স্পষ্ট দেখলাম একটা ছবি। ছবিটা প্রতাপ গুহর। তার নীচের ইংরেজিতে লেখা আছে জন্ম ২০ মে ১৯২২, মৃত্যু ২৭ আগস্ট ১৯৬৭! অর্থাৎ তেরো বছর আগে...

আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। আমার মাথাটা মনে হল ঘাড় থেকে সরে যাচ্ছে। আমি কী একটা বললাম হয়তো চেঁচিয়েই...তারপর?

আমি চোখ মেললাম যখন তখন দেখি মাথার পাশে তিনটে মাথা ঝুঁকে আছে; চন্দন, বাপ্পা আর প্রতাপবাবুর। ঘর আলোয় ঝলমল করছে। আমি ঘাড় কাত করে দেখলাম, চমৎকার একটা পুরোনো কার্পেটের ওপর আমি শুয়ে আছি। প্রতাপবাবুই প্রথম প্রশ্ন করলেন, কী মশাই! কী হয়েছিল আপনার! একটা সামান্য সুইচ জ্বালতে গিয়ে ভিরমি খেয়ে পড়লেন?

বাপ্পা বলল, গল্পের বই বেশি পড়ার এফেক্ট। যখন-তখন যেখানে-সেখানে যা খুশি কল্পনা করে নেয়। চন্দন বলল, ও আসলে একটু নার্ভাস টাইপের। আমার মুখ দিয়ে শুধু বেরোল, কিন্তু ছবিটা?

এবার প্রতাপবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোন ছবি বলুন তো? কোথায়? আমি আঙুল উঁচিয়ে দেখালাম ওই বইয়ের তাকটার দিকে। সবাই ঘুরে তাকাল তাকটার দিকে। কিন্তু সেখানে কোনো ছবি বা ছবির ফ্রেম দেখা গেল না। প্রতাপবাবু খুব আওয়াজ করে হেসে উঠলেন, বুঝেছি, ভাই বুঝেছি। এ বাড়ির চেহারা আর আসবাবপত্র দেখে আপনি ভৌতিক কান্ডকারখানা কল্পনা করতে

শুরু করেছেন। তাই তো? তা হলে বলি শুনুন, ওই ভূত-ফুত একদম বাজে জিনিস। পৃথিবীর সমস্ত কিছুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়। এমনকী অস্বাভাবিক মৃত্যুরও। যদি কেউ কেবল ভয় পেয়েই হার্টফেল করে তারও তো কতকগুলো সিম্পটমস আছে। তাই না? মৃত্যুর প্রকারও যেমন বিবিধ তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বিভিন্ন?

বাপ্পা আর চন্দন খুব মনোযোগ দিয়ে প্রতাপ গুহর কথা শুনছে আর সায় দিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে মনে বল পেয়ে কার্পেটে উঠে বসলাম আমিও। আমাকে দেখে প্রতাপবাবু বলে উঠলেন, এই তো, দেখুন তো কেমন সাহসী হয়ে গেলেন আপনি। নিন একটু চা খান। এই বলে প্রতাপবাবু তাঁর দশাসই মিলিটারি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে সবাইকে দিলেন। তারপর নিজের চায়ে চুমুক দিয়ে পাইপ ধরালেন। আর বললেন, এই যে ছাইদানিটা। বাইরে থেকে বলপ্রয়োগ না করে এটাকে কি একচুলও নড়ানো সম্ভব?

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, না। কখনো না।

প্রতাপবাবু দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, আর ওই যে লাইটের সুইচ। ওটাকে কাছে গিয়ে নিভিয়ে না দিলে কি ঘরের আলো নেভানো যায়?

আমরা সমস্বরে ফের বললাম, না। কখনো না।

আর ঠিক তখনই ঘরের সুইচটা খুট করে আপনা-আপনি অফ হয়ে গেল। উজ্জ্বল আলোকিত ঘরটা মুহূর্তের মধ্যে ঘুটঘুটে অন্ধকার হল। আর আমরা পরিষ্কার শুনতে পেলাম, কাঠের মেঝের উপর ভারী লোহার অ্যাশট্রেটা ঘড়ঘড়, খড়খড় শব্দ করে নিজেই চলে বেড়াচ্ছে। ঠিক তখনই দূরে দরজার কাছ থেকে ভেসে এল প্রতাপ গুহর কণ্ঠস্বর, আমার তরুণ বন্ধুরা, আমি একটু আগেই বলেছি প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াকলাপেরই একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

আছে। এবার বলছি ওই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রের আবার একটা ব্যতিক্রমও থাকে।

আমার শরীর হিম হতে শুরু করেছে ততক্ষণে। বুঝতে পারলাম অন্য দুই বন্ধুও নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ওই অন্ধকারের মধ্যেই হয় চন্দন কিংবা বাপ্পার হাতের স্পর্শ পেলাম হাঁটুর ওপর। তারপর ফিসফিস করে জড়ানো বাপ্পার কণ্ঠস্বর, পাবক, আমাদের পালাতে হবে। উঠে আয়।

বাপ্পা কথাটা যেভাবে আমার কানের কাছে বলেছিল তাতে দূরে দাঁড়ানো প্রতাপ গুহ কিংবা তাঁর বিদেহী আত্মার শোনার কথা নয়। কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, এত রাতে কোথায় যাবেন, এই তো বেশ আশ্চর্য সাক্ষাৎ আমাদের।

ওঁর কথা শেষ হতেই দড়াম করে সজোরে বন্ধ হয়ে গেল বাড়ির বাইরে যাওয়ার দরজাটা। আর অমনি প্রাণপণ চিৎকার করে উঠল চন্দন, আপনি কী পেয়েছেন কী? দরজাটা খুলে দিন, আমরা এক্ষুণি বেরিয়ে যাব।

কিন্তু এবার কোনো শব্দ এল না। শুধু তিনটে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসের আওয়াজে ঘর ভরে গেল। আর দূর থেকে ভেসে আসতে থাকল ঝরনার জলের আওয়াজ। আমরা আমাদের হৃৎপিন্ডের ধুকপুকুনি শুনতে পাচ্ছি তখন। আমি নিজেকে বোঝালাম, কোনোমতেই জ্ঞান হারাব না। হারালেই মৃত্যু।

এবার চন্দন ওর দেশলাইটা বার করে একটা কাঠি জ্বালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বারে বারে চেষ্টা করে একটাও কাঠি জ্বলল না। যখন বিরক্ত হয়ে ও দেশলাই ফের পকেটে খুঁজতে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ওর আর আমাদের

মাঝখানে একটা হাত উঠে এল। সেই হাতে একটা বিলিতি লাইটার। আর আমার কানের পাশ থেকে প্রতাপ গুহর গলা, এই নিন লাইট।

চন্দন ওর পকেটের একটা সিগারেট বার করে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, ধর পাবক। কিন্তু আমার হাত আর উঠল না। আমি শুধু ওই লাইটারের আলোয় দেখছি তাকের উপর পূর্বের দেখা প্রতাপ গুহর সেই ছবিটা। ওটা আবার জায়গামতো ফিরে এসেছে। প্রতাপ গুহ সেটা লক্ষ করে বললেন, আপনি ঠিকই দেখেছিলেন। ঘরে আলো না থাকলে ছবিটা দেখা যায়। কিন্তু আলো থাকলে চোখে পড়বে না।

আমার শরীরে যেটুকু শক্তি বাকি ছিল তার সবটুকু জড়ো করে এবার গর্জে বলে উঠলাম, প্রতাপবাবু, আপনি আলো জ্বালুন। আমাদের মারতে হয়, আলোতে মারুন আর না হলে এখান থেকে বার হয়ে যেতে দিন।

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল প্রতাপ গুহর লাইটার। আর ওঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। বাড়ির ভিতরের দিকের দরজার পাশ থেকে, এ বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি বলে পদার্থ নেই। এখানে আলো যা দেখছিলেন সেটা চোখের ভ্রম। অসুবিধে হলে ফায়ার-প্লেসের আগুনটা জ্বালিয়ে নিন।

চন্দন বলল, আমার দেশলাই ড্যাম্প। প্রতাপ গুহ বললেন, ফের চেষ্টা করুন। চন্দন ওর দেশলাইতে ফের কাঠি মারতে ফস করে জ্বলে উঠল সেটা! এবারে চন্দন অন্ধকারে ক্রমাগত দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে পৌঁছে গেল ফায়ার প্লেসের সামনে! একটা কাঠি ছোঁয়াতেই জ্বলে উঠল বহুদিনের শুকনো, দাহ্য লকড়িগুলো। দূর থেকে প্রতাপ গুহর গলা ভেসে এল, বেশ! তারপর একটু থেমে বলল, আরেক রাউণ্ড চা হবে নাকি?

আমাদের তিনজনের মধ্যেই তখন মৃত্যুভয় সমান। কিন্তু তিনজনেই একই সঙ্গে বলে উঠলাম, দিন। ক্ষণিকের জন্য আমার মনে হল ওই সব ভূত-ফুত কিছু নয়। প্রতাপ গুহ আমাদের সম্মোহিত করেছেন। চায়ের গ্লাস হাতে নিতেই তার উষ্ণ অনুভূতি হাতের ভেতর দিয়ে শরীরের সর্বত্র পৌঁছে গেল! গন্ধ পেলাম পাইপের তামাকের। আবছা অন্ধকারে দেখলাম ধিকি ধিকি করে জ্বলছে প্রতাপ গুহর পাইপ।

আমরা চা খেয়ে একটু চাঙা হয়েছি দেখেই প্রতাপ গুহ বলতে শুরু করলেন, এই বাড়িটাই আমার কাল হয়েছে। আমি এটাকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। আমাকে আপনারা সাহায্য করবেন!

আমরা? আমরা কী করে সাহায্য করব ওকে? উনি নিজেই তো সব পারেন। আমরা এই কথাটা মুখে উচ্চারণ করিনি। প্রতাপ গুহ নিজের থেকেই সেটা আঁচ করলেন, দেখুন আমি সবই পারি। আপনাদের খুন করা থেকে এই বাড়ি পোড়ানো অবধি সবই। কিন্তু আমি এমন কিছু করব না যার কোনো ব্যাখ্যা মানুষের কাছে থাকবে না! অথচ প্রতি ৭ আগস্ট তারিখে আমি আর এই বাড়িতে ফিরে আসতে পারছি না। বিলিভ মি, আই অ্যাম টায়ার্ড।

ওই ৭ আগস্ট তারিখটা ঝাঁ করে আমার মাথায় খেলে গেল। আরে হ্যাঁ আজই তো সেই ৭ আগস্ট! কিন্তু, এই তারিখটাই আমি কোথায় যেন দেখেছি সোনার জলে লেখা! আমি বার বার মাথা খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করছিলাম! সেটা যখন বাপ্পা খুব নিস্পাপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে বসল, ৭ আগস্ট কি আপনার মৃত্যুদিন? আর অমনি আমার মনে পড়ল প্রতাপ গুহর ছবির নীচে লেখা ছিল তারিখটা। তা হলে! তা হলে সত্যিই আমরা একটা অশরীরী আত্মার কবলে পড়লাম? আমি টের পেলাম আমার মাথা আর বেশিক্ষণ স্থির থাকবে না। যা করবার এখনই করা দরকার। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম,

আপনার জন্য যা যা করণীয় বলুন। আমরা করব। আমরা আর দেরি করতে পারব না। আমার দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়ল বাপ্পা আর চন্দনও। ওদিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতাপ গুহ বললেন, ওই ফায়ার প্লেস থেকে আগুন নিয়ে ঘরের পরদায় লাগান। তারপর ফার্নিচারে। আর দেখবেন আপনাদের মালপত্রগুলো বার করতে যেন ভুল না হয়।

বাপ্পা আমাদের লাগেজগুলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। আর আমি ওই ফায়ার প্লেসের জ্বলন্ত স্টিকগুলো দিয়ে ঘরের সমস্ত জিনিসে আগুন লাগাতে থাকলাম। চন্দনও কিছু স্টিক নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। আর পিছনে ঝরনার দিকের ঘরের থেকে ভেসে আসতে থাকল প্রতাপ গুহর উদাত্ত কণ্ঠে গান,

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো,
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে, আগুনের ...

আমরা জানি না কতক্ষণ এই ধ্বংসলীলায় মেতে থেকেছিলাম। সমস্ত বাড়িটাই যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আর ক্রমশ আগুনের শিখা পাশের পাইন গাছের সমান হয়ে উঠল তখন পূর্ব আকাশে সূর্যোদয়েরও প্রথম আভাস দেখা গেল। কী এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের তিনজনের কেউই জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলাম না। একটা অলৌকিক ঘটনাকে নিছক অলৌকিক বলে ছেড়ে দিতে মন সরল না। আমরা নিজেরাই গিয়ে দমকলে এবং পুলিশে খবর দিলাম। আর কারণ হিসেবে বললাম, ফায়ার প্লেসের আগুন কার্পেটে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকান্ড বাঁধে।

কিন্তু পুলিশ আমাদের কথায় বিশ্বাস করল না। উলটে জানতে চাইল, আমরা এই অভিশপ্ত বাড়ির সন্ধান পেলাম কী করে। তখন বাধ্য হয়ে কবুল করলাম

ট্যাক্সিতে প্রতাপ গুহর সঙ্গে পরিচয়ের কথা। আর অমনি কপালে চোখ চড়ে গেল পুলিশের দারোগার। বললেন, বলেন কী, ট্যাক্সিতে? একটা ডিপ ব্লু রঙের অ্যাম্বাসাডারে?

চন্দন বলল, হ্যাঁ।

দারোগা বললেন, বুঝেছি।

ভয়ংকর কৌতূহল জেগেছিল আমারও। জিজ্ঞেস করলাম, কেন বলুন তো? গাড়িটার রহস্য কী?

একটাই। দারোগা গম্ভীর মুখে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'রহস্য একটাই। ওই গাড়িতে প্রতাপ গুহ আর ওই ট্যাক্সি ড্রাইভার খুন হয়েছিলেন বছর বারো-তেরো আগে।

কোথায়?

এই শিলঙে ঢুকতে একটা সস্তা হোটেলের সামনে।

এবার চমকে উঠল চন্দন। কারণ একটা সস্তা হোটেল থেকে আগের দিন রুটি-মাংস কিনেছিল ও। এবার প্রশ্ন করল ও-ই, আচ্ছা, দোকানের মালিকের একটা চোখে কি গর্ত?

আর মুখে বসন্তের দাগ?

দারোগা ঘাড় নেড়ে বললেন, এগজ্যাক্টলি। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? ও দোকানটা তো আর নেই।

আমাদের আর বৈজ্ঞানিক যুক্তি খোঁজার মানসিক অবস্থা ছিল না। আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না, আগের দিনের ট্যাক্সি ট্রিপ থেকে শুরু করে ওই অগ্নিকান্ড অবধি যাবতীয় ঘটনার কতখানি বাস্তব, কতখানি অলৌকিক।

আমাদের চোখের সামনে দারোগা খস খস করে কেস রিপোর্টে লিখলেন, এ কেস অব অ্যাক্সিডেন্টাল ফায়ার। অথচ আমাদের স্পষ্ট মনে পড়ছিল কীভাবে আমি আর চন্দন আগুনের কাঠি দিয়ে দিয়ে গোটা বাড়িতে আগুন ছড়িয়েছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনর্থক হাজতবাসে আমাদের কারোরই কোনো আগ্রহ ছিল না। এ ছাড়া এও জানতাম যা দেখেছি যা জেনেছি তার কোনো কার্যকারণ ব্যাখ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা কোনোদিন নেই।